

# বাংলা সাহিত্য

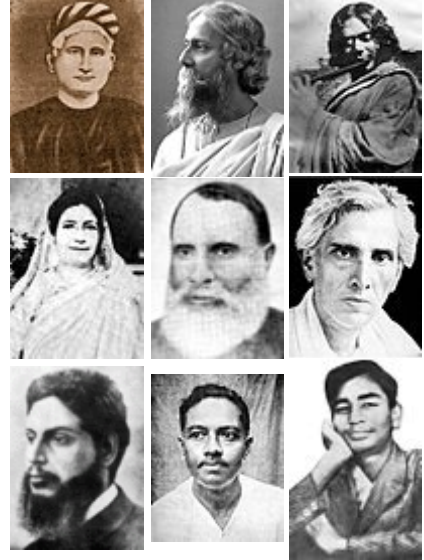
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম **বাংলা সাহিত্য** নামে পরিচিত। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ দোঁহা-সংকলন *চর্যাপদ* বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ছিল কার্যপ্রধান। হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাসগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সময়কার বাংলা সাহিত্য। *মঙ্গলকাব্য*, *বৈষ্ণব পদাবলি*, *শাক্তপদাবলি*, *বৈষ্ণব সত্তাজীবনী*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, পীরসাহিত্য, নাথসাহিত্য, বাউল পদাবলি এবং ইসলামি ধর্মসাহিত্য ছিল এই সাহিত্যের মূল বিষয়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের যুগে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই সময় থেকে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর বদলে মানুষ, মানবতাবাদ ও মানব-মনস্তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বাংলা সাহিত্যও দুটি ধারায় বিভক্ত হয়: কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের সাহিত্য। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্যধারা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

## পরিচ্ছেদসমূহ

- ১ যুগ বিভাজন
  - ১.১ আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ
  - ১.২ মধ্যযুগ
    - ১.২.১ ত্রয়োদশ শতাব্দী: বাংলা সাহিত্যের "অন্ধকার যুগ"
- ২ প্রাক চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্য
  - ২.১ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন
  - ২.২ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব গান
  - ২.৩ মালাধর বসু এবং কৃতিবাস ওঝা
  - ২.৪ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্য
- ৩ আধুনিক যুগ
  - ৩.১ প্রাক-রবীন্দ্র যুগ
  - ৩.২ রবীন্দ্র যুগ
  - ৩.৩ রবীন্দ্রোত্তর যুগ
    - ৩.৩.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য
    - ৩.৩.২ পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য
    - ৩.৩.৩ পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের সাহিত্য
  - ৩.৪ সাহিত্যধারা
    - ৩.৪.১ চর্যাপদ

## বাংলা সাহিত্য



66px



চর্যাপদ পুথি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম

বেগম রোকেয়া, নীর মশাররফ হোসেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জীবনানন্দ দাশ সুকান্ত ভট্টাচার্য

শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ

বাংলা সাহিত্য  
(বিষয়শ্রেণী তালিকা)

বাংলা ভাষা

সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বাঙালি সাহিত্যিকদের তালিকা

কালানুক্রমিক তালিকা - বর্ণানুক্রমিক তালিকা

বাঙালি সাহিত্যিক

লেখক - ঔপন্যাসিক - কবি

সাহিত্যধারা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়

চর্যাপদ - মঙ্গলকাব্য - বৈষ্ণব পদাবলি ও সাহিত্য -  
নাথসাহিত্য - অনুবাদ সাহিত্য - ইসলামি সাহিত্য -  
শাক্তপদাবলি - বাউল গান

আধুনিক সাহিত্য

উপন্যাস - কবিতা - নাটক - ছোটগল্প - প্রবন্ধ -  
শিশুসাহিত্য - কল্পবিজ্ঞান

- ৩.৪.২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
- ৩.৪.৩ মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্য
- ৩.৪.৪ মধ্যযুগীয় ইসলামি সাহিত্য
- ৩.৪.৫ বৈষ্ণব পদাবলি
- ৩.৪.৬ চৈতন্যজীবনীসাহিত্য
- ৩.৪.৭ মঙ্গলকাব্য
- ৩.৪.৮ রাজসভার সাহিত্য
- ৩.৪.৯ শিবায়ন কাব্য
- ৩.৪.১০ শাক্তপদাবলি
- ৩.৪.১১ নাথ সাহিত্য
- ৩.৪.১২ বাউল সাহিত্য
- ৩.৪.১৩ বাংলা লোক সাহিত্য
- ৩.৪.১৪ বাংলা গদ্যের উন্মেষপর্ব
- ৩.৫ রবীন্দ্রসাহিত্য
- ৩.৬ কবিতা
- ৩.৭ ছোটগল্প
- ৩.৮ উপন্যাস
- ৩.৯ প্রবন্ধ ও পত্রসাহিত্য
- ৩.১০ নাট্যসাহিত্য
  - ৩.১০.১ আধুনিক বাংলা কবিতা
  - ৩.১০.২ বাংলা নাটক
  - ৩.১০.৩ বাংলা কথাসাহিত্য
  - ৩.১০.৪ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য
  - ৩.১০.৫ সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র
- ৩.১১ কবি ও সাহিত্যিক
  - ৩.১১.১ মধ্যযুগ (১৩৫০-১৮০০খ্রিস্টাব্দ)
  - ৩.১১.২ প্রাক-আধুনিক যুগ  
(১৮০০খ্রিস্টাব্দ-১৯০০খ্রিস্টাব্দ)
  - ৩.১১.৩ আধুনিক যুগ (১৯০০খ্রিস্টাব্দ-১৯৪৭  
খ্রিস্টাব্দ)
  - ৩.১১.৪ বর্তমান
- ৩.১২ সাহিত্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
- ৩.১৩ সাহিত্য পুরস্কার
- ৩.১৪ আরও দেখুন
- ৩.১৫ তথ্যসূত্র
- ৩.১৬ বহিঃসংযোগ

## প্রতিষ্ঠান ও পুরস্কার

ভাষা শিক্ষায়ন  
সাহিত্য পুরস্কার

সম্পর্কিত প্রবেশদ্বার  
সাহিত্য প্রবেশদ্বার  
বঙ্গ প্রবেশদ্বার

# যুগ বিভাজন

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত:<sup>[১]</sup>

- আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ৬৫০ খ্রি. মতান্তরে ৯৫০ খ্রি.–১২০০ খ্রি.)
- মধ্যযুগ (১২০১ খ্রি.–১৮০০ খ্রি.)
- আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি.–বর্তমান কাল)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো নির্দিষ্ট সালতারিখ অনুযায়ী সাহিত্যের ইতিহাসের যুগ বিভাজন করা সম্ভব নয়। যদিও সাহিত্যের ইতিহাস সর্বত্র সালতারিখের হিসেব অগ্রাহ্য করে না। সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট যুগের চিহ্ন ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করেই সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয়ে থাকে।

## আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ

বাংলা সাহিত্যের উন্মেষের পূর্বে বাংলায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্ট ভাষায় সাহিত্য রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। এই সাহিত্যের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের আদি অধ্যায়ের সূচনা হয়।<sup>[৩]</sup> ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি বিজয়ের বহু পূর্বেই বাঙালিরা একটি বিশেষ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উন্মেষ ঘটে বাংলা ভাষায়ও। তবে প্রথম দিকে বাংলায় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেনি। সংস্কৃত ভাষায় লেখা অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধরের কাব্যকবিতা, জয়দেবের *গীতগোবিন্দম্*, *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* ও *সদুক্তিকর্ণামৃত* নামক দুটি সংস্কৃত শ্লোকসংগ্রহ; এবং অবহট্ট ভাষায় রচিত কবিতা সংকলন *প্রাকৃত-পৈঙ্গল* বাঙালির সাহিত্য রচনার আদি নিদর্শন। এই সকল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত না হলেও সমকালীন বাঙালি সমাজ ও মননের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।<sup>[৪][৫]</sup> পরবর্তীকালের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে *গীতগোবিন্দম্* কাব্যের প্রভাব অনস্বীকার্য।



বিষ্ণুর সম্মুখে প্রণত জয়দেব; বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর *গীতগোবিন্দম্* কাব্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে রচিত কাব্যেও জয়দেবের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর।

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আদিম নিদর্শন হল চর্যাপদ। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত চর্যাপদাবলি ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনসংগীত। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণ বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে চর্যাপদ ভাষা প্রকৃতপক্ষে হাজার বছর আগের বাংলা ভাষা। সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্র এই পদগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যমূল্যের বিচারে কয়েকটি পদ কালজয়ী।

## মধ্যযুগ

### ত্রয়োদশ শতাব্দী: বাংলা সাহিত্যের "অন্ধকার যুগ"

বাংলা সাহিত্যের ১২০০-১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে “অন্ধকার যুগ” বা “বন্ধ্য যুগ” বলে কেউ কেউ মনে করেন। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর “লাল নীল দীপাবলী” গ্রন্থে (পৃ. ১৭) লিখেছেন- “১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়না বলে এ-সময়টাকে বলা হয় ‘অন্ধকার যুগ’। পণ্ডিতেরা এ-সময়টাকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু কেউ অন্ধকার সরিয়ে ফেলতে পারেন নি। এ-সময়টির দিকে তাকালে তাই চোখে কোন আলো আসেনা, কেবল আঁধার ঢাকা চারদিক।” কিন্তু, ওয়াকিল আহমদ তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত’ (পৃ. ১০৫)-এ লিখেছেন- “বাংলা সাহিত্যের কথিত ‘অন্ধকার যুগ’ মোটেই সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্মক যুগ ছিল না। ধর্ম-শিক্ষা শিল্প চর্চার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তারা সীমিত আকারে হলেও শিক্ষা সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে, কি হিন্দু কি মুসলমান কেউ লোকভাষা বাংলাকে গ্রহণ করেননি। বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন না থাকার এটাই মুখ্য কারণ।”

এসময়ের সাহিত্য নিদর্শন: ১. প্রাকৃত ভাষার গীতি কবিতার সংকলিত গ্রন্থ ‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’ ২. রামাই পন্ডিত রচিত ‘শূন্যপুরাণ’ (গদ্যপদ্য মিশ্রিত) ৩. হলায়ুধ মিশ্র রচিত ‘সেক শুভোদয়া’ (গদ্যপদ্য মিশ্রিত) ৪. ডাক ও খনার বচন

- ‘নিরঞ্জনর উম্মা’ শূন্যপুরাণ এর অন্তর্গত একটি কবিতা।<sup>[৬]</sup>

# প্রাক চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্য

প্রাক চৈতন্য বা প্রারম্ভিক বৈষ্ণব সাহিত্য বলতে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়কালের পূর্বে রচিত সাহিত্যকে বুঝায়। এর মধ্যে রয়েছে: বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন; এটি মূলত গীতধর্মী কবিতার সংকলন যা বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলি নামে পরিচিত; শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, এটি হল ভগবৎ পুরাণের আংশিক অনুবাদ যা মালাধর বসু কর্তৃক রচিত এবং কৃতিবাসের রামায়ণ যা কৃতিবাস ওঝা দ্বারা রচিত হয়েছে।

## শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্যতভঙ্গব আধুনিক দিনের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্লা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ছিন্নপত্রের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বড় চণ্ডীদাস কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। চর্যাপদের পরে এটি বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রাচীনতম কাজ বলে বিবেচিত হয়।

## বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব গান

পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণব গদ্য কবিতার বা বাংলা পদাবলির উত্থান হয়েছিল। মিথিলার মহান কবি বিদ্যাপতির কবিতা যদিও তা বাংলা ভাষায় লিখিত হয়নি তথাপি এটি বাংলা সাহিত্যকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে এটি তাকে মধ্য-বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে তোলে। চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি ভারতের বিহারের আধুনিক ডারবঙ্গ জেলায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বৈষ্ণব গান বাংলার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল। চণ্ডীদাস ছিলেন প্রথম প্রধান বাঙালি কবি যিনি বৈষ্ণব গান লিখেছিলেন, যিনি আধুনিক দিনের বীরভূম জেলার (বা অন্য মতামত অনুযায়ী, বাঁকুড়া জেলার) পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। চণ্ডীদাস তাঁর মানবতার ঘোষণার জন্য সুপরিচিত- "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই..."।

## মালাধর বসু এবং কৃতিবাস ওঝা

দুটি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ ভাগবত পুরাণ এবং রামায়ণ মধ্য বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, লর্ড কৃষ্ণের বিজয়), যা মূলত ভাগবত পুরাণের দশম এবং একাদশ পাঠের অনুবাদ, এটি একটি পূর্বতন বাংলা কাহিনী যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা যায়। পঞ্চদশ শতকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গে মালাধর বসু সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেছিলেন। ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে রচিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ছিল কৃষ্ণের কিংবদন্তীর প্রাচীনতম বাংলা বর্ণনামূলক কবিতা।

রামায়ণ শ্রী রাম পাঁচালী শিরোনামের অধীনে যা কৃতিবাসী রামায়ণ নামেও পরিচিত কৃতিবাস ওঝা দ্বারা অনুবাদিত হয়েছিল, যিনি আজাদ নদীয়া জেলার অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তিনিও মালাধর বসুর মতো পঞ্চদশ শতকেরও বেশি সময় ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন।

## চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্য

চৈতন্যোত্তর বা বৈষ্ণব পরবর্তী সাহিত্য চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় পরবর্তীকালের সাহিত্যের সূচনা করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে, চৈতন্যের জীবনের উপর ভিত্তি করে এবং পরে বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত বা কবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব পরবর্তী সাহিত্যের প্রধান পদকর্তা ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, জয়ানন্দ, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রমুখ।

## আধুনিক যুগ

মূলত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও, মোটামুটি ভাবে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ ভারত চন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে নানা সমালোচক মতপ্রকাশ করেছেন। কালের দিক থেকে আধুনিক যুগকে কয়েক টি ধাপে ভাগ করা যায়- ১৭৬০-১৭৯৯খ্রিঃ(আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব) ১৮০০-১৮৫৮খ্রিঃ(আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্ব) ১৮৫৯-১৯০০খ্রিঃ(আধুনিক যুগের তৃতীয় পর্ব) ১৯০১-১৯৪৭খ্রিঃ(আধুনিক যুগের চতুর্থ পর্ব) ১৯৪৮-২০০০খ্রিঃ(আধুনিক যুগের পঞ্চম পর্ব) ২০০১খ্রিঃ- বর্তমানকাল(আধুনিক যুগের ষষ্ঠ পর্ব)

## প্রাক-রবীন্দ্র যুগ

## রবীন্দ্র যুগ

## রবীন্দ্রোত্তর যুগ

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

## পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য

## পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের সাহিত্য

# সাহিত্যধারা

## চর্যাপদ

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কাব্য তথা সাহিত্য নিদর্শন। নব্য ভারতীয় আর্থভাষ্যরও প্রাচীনতম রচনা এটি।<sup>[৭]</sup> খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই গীতিপদাবলির রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ়ার্থ সাংকেতিক রূপবন্ধে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই তাঁরা পদগুলি রচনা করেছিলেন। বাংলা সাধন সংগীতের শাখাটির সূত্রপাতও এই চর্যাপদ থেকেই। এই বিবেচনায় এটি ধর্মগ্রন্থ স্থানীয় রচনা। একই সঙ্গে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলি এই পদগুলিতে উজ্জ্বল। এর সাহিত্যগুণ আজও চিতাকর্ষক। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে চর্যার একটি খণ্ডিত পুঁথি উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলা ভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চর্যার প্রধান কবিগণ হলেন লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, শবরপাদ প্রমুখ।



চর্যাপদ পুঁথির একটি পৃষ্ঠা

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ুচণ্ডীদাস নামক জনৈক মধ্যযুগীয় কবি রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা বিষয়ক একটি আখ্যানকাব্য।<sup>[৮]</sup> ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে এই কাব্যের একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে পুঁথিটি প্রকাশিত হয়।<sup>[৯]</sup> যদিও কারও কারও মতে মূল গ্রন্থটির নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। কৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবনে রাধার সঙ্গে তাঁর প্রণয় এবং অন্তে বৃন্দাবন ও রাধা উভয়কে ত্যাগ করে কৃষ্ণের চিরতরে মথুরায় অভিপ্রয়াণ – এই হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল উপজীব্য। আখ্যানভাগ মোট ১৩ টি খণ্ডে বিভক্ত। পুঁথিটি খণ্ডিত বলে কাব্যরচনার তারিখ জানা যায় না। তবে কাব্যটি আখ্যানধর্মী ও সংলাপের আকারে রচিত বলে প্রাচীন বাংলা নাটকের একটি আভাস মেলে এই কাব্যে। গ্রন্থটি স্থানে স্থানে আদিরসে জারিত ও গ্রাম্য অলীলতাদোষে দুষ্ট হলেও আখ্যানভাগের বর্ণনানৈপুণ্য ও চরিত্রচিত্রণে মুগ্ধিয়ানা আধুনিক পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চর্যাপদের পর ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ বাংলা ভাষার দ্বিতীয় প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শন। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এর গুরুত্ব তাই অপরিসীম। অপরদিকে এটিই প্রথম বাংলায় রচিত কৃষ্ণকথা বিষয়ক কাব্য। মনে করা হয়, এই গ্রন্থের পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলির পথ সুগম হয়।

## মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল এবং পরিণামে এ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অপরিসীম। সকল সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতীক্রম পরিলক্ষিত হয় না। "সমৃদ্ধতর নানা ভাষা থেকে বিচিত্র নতুন ভাব ও তথ্য সংগ্রহ করে নিজ নিজ ভাষার বহন ও সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলাই অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক প্রবণতা।" ভাষার মান বাড়ানোর জন্য ভাষার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হয়, আর তাতে সহায়তা করে অনুবাদকর্ম। উন্নত সাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করা কখনো অযৌক্তিক বিবেচিত হয়নি। উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা-সাহিত্যের সান্নিধ্যে এলে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিশব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়, অন্য ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দও গ্রহণ করা যায়। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বক্তব্য আয়ত্তে আসে। ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্পদশালী ভাষায় উৎকর্ষপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির অনুবাদ একটি আবশ্যিক উপাদান।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ের বেলায় শুদ্ধ অনুবাদ অভিপ্রেত। কিন্তু সাহিত্যের অনুবাদ শিল্পসম্মত হওয়া আবশ্যিক বলেই তা আক্ষরিক হলে চলে না। ভিন্ন ভাষার শব্দ সম্পদের পরিমাণ, প্রকাশক্ষমতা ও বাগভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত কথায় সংকোচন, প্রসারণ, বর্জন ও সংযোজন আবশ্যিক হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে অনুবাদের ধারাটি সমৃদ্ধি লাভ করে তাতে সৃজনশীল লেখকের প্রতিভা কাজ করেছিল। সে কারণে মধ্যযুগের এই অনুবাদকর্ম সাহিত্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।

বুলিকে লেখ্য ভাষার তথা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত করার সহজ উপায় হচ্ছে অনুবাদ। অন্যভাষা থেকে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-মননের বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করতে হলে সে বিষয়ক ভাব-চিন্তা-বস্তুর প্রতিশব্দ তৈরি করা অনেক সময় সহজ হয়, তৈরী সম্ভব না হলে মূল ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করতে হয়। এভাবেই সভ্য জাতির ভাষা-সাহিত্য মাত্রই গ্রহণে-সৃজনে ঋদ্ধ হয়েছে। এ ঋণে লজ্জা নেই। যে জ্ঞান বা অনুভব আমাদের দেশে পাঁচশ বছরেও লভ্য হত না, তা আমরা অনুবাদের মাধ্যমে এখনই পেতে পারি। যেমনঃ বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলো, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাগুলো, বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো, সমাজতত্ত্বগুলো-মানবচিন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো এভাবে আয়ত্তে আসে।

চৌদ্দ পনেরো শতকে আমাদের লেখ্য সাহিত্যও তেমনি সংস্কৃত-অবহট্ট থেকে ভাব-ভাষা-ছন্দ গ্রহণ করেছে, পুরাণাদি থেকে নিয়েছে বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি এবং রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-প্রণয়োপাখ্যান-ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত-ফারসী-আরবী-হিন্দি থেকে অনূদিত হয়েছে আমাদের ভাষায়। এভাবেই আমাদের লিখিত বা শিষ্ট বাংলা ভাষাসাহিত্যের বুনিয়াদ নির্মিত হয়েছিল।

আদর্শ অনুবাদকের একটা বিশেষ যোগ্যতা অপরিহার্য। ভাষান্তর করতে হলে উভয় ভাষার গতিপ্রকৃতি, বাকভঙ্গি ও বাকবিধির বিষয়ে অনুবাদকের বিশেষ ব্যুৎপত্তির দরকার। তাহলেই ভাষান্তর নিখুঁত ও শিল্পগুণাঙ্কিত হয়। তাই ভাষাবিদ কবি ছাড়া অন্য কেউ কাব্যের সুষ্ঠু অনুবাদে সমর্থ হয় না। মধ্যযুগে অ-কবিও অনুবাদ কর্মে উৎসাহী ছিলেন। তাই অনুবাদে নানা ত্রুটি দেখা যায়। এছাড়া এঁরা নিজেদের সামর্থ্য রুচিবৃদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে মূল পাঠের গ্রহণ-বর্জন ও সংক্ষেপ করেছেন। এজন্য মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কোন তথাকথিত অনুবাদই নির্ভরযোগ্য নয়। সবগুলোই কিছু কায়িক, কিছু ছায়িক, কিছু ভাবিক অনুবাদ এবং কিছু স্বাধীন রচনা। কাব্য সাহিত্যের অনুবাদ আক্ষরিক হতেই পারে না।

## মধ্যযুগীয় ইসলামি সাহিত্য

### বৈষ্ণব পদাবলি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য একটি বিস্তৃত কালপর্ব জুড়ে বিন্যস্ত। প্রাকচৈতন্যযুগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য ও চৈতন্য পরবর্তী যুগে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস বিশেষভাবে খ্যাতিমান হলেও আরও বহু কবি বৈষ্ণব ধর্মপ্রাণিত পদ লিখেছেন। তবে ধর্মবর্ণনাবিশেষে পদাবলি চর্চার এই ইতিহাস চৈতন্যের ধর্মোদ্বোধনের পরই ছড়িয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির মূল বিষয়বস্তু হল কৃষ্ণের লীলা এবং মূলত মাধুর্যলীলা। অবশ্য এমন নয় যে কৃষ্ণের ঐতিহ্যলীলার চিত্রণ হয়নি। তবে সংখ্যাধিক্যের হিসেবে কম। আসলে বৈষ্ণব পদাবলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা স্তরে স্তরে এমন গভীর ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে অনেকের ধারণা বাংলা সাহিত্যে এ আসলে একটি রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের নমুনা। বস্তুত পৃথিবীর অন্যান্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মতনই এও বিশেষভাবে ধর্মপ্রাণিত ও বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ববিশ্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তবে যে কোন ধর্মের মতনই বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বেরও অনেকগুলি ঘরানা ছিল। এর মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগোষ্ঠী। এদের ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব পড়েছে চৈতন্যপরবর্তী পদকর্তাদের রচনায়। প্রাকচৈতন্যযুগের পদাবলিকারদের রচনায় তত্ত্ব বা নানা সহজিয়া সাধনপন্থার প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় সাধনপন্থা মূলত দ্বিপথগামী- স্মার্ত ও তান্ত্রিকী। শশীভূষণ দাশগুপ্ত এই দুই পথকেই বলেছেন "উল্টাসাধন"<sup>[১৩]</sup> তত্ত্বও হল এই উল্টাসাধনই। দেহভান্ডাই হল ব্রহ্মান্ড এই বিশ্বাস সহজিয়া ও তান্ত্রিক পন্থীদের। সেই কারণে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সঙ্গে জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসদের মূলগত প্রভেদ রয়েছে। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগোষ্ঠী যে তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণ করলেন তাতে কৃষ্ণলীলার মূল উৎস ভাগবত ও আন্যান্য পুরাণ হলেও, আসলে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, সর্বোপরি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা প্রাধান্য পেল। কেননা এঁদের মতে কৃষ্ণের দুই রূপ। প্রথমটি ঐশ্বর্যস্বরূপ ঈশ্বর, যিনি সর্বশক্তিমান। কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ প্রতিটি লোক সে তাঁর মাতা-পিতা বা, স্ত্রী বা সখা যেই হোক না কেন- কৃষ্ণকে তাঁরা ভগবান বলে জানেন, সেভাবেই তাঁকে দেখেন। দ্বিতীয়টি হল মাধুর্যস্বরূপ কৃষ্ণ। এইরূপে কৃষ্ণের লীলার যে বিচিত্র প্রকাশ অর্থাৎ প্রভুরূপে, পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রেমিকরূপে সর্বোপরি রাধামাধবরূপে তাতে কোথাও কৃষ্ণের মনে বা কৃষ্ণলীলাসংস্কারদের মনে কৃষ্ণের

ঐশ্বর্যমূর্তির জাগরণ ঘটেনা। ঐশ্বর্যমূর্তি নেই বলে কৃষ্ণভক্তি এখানে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হয়ে শুদ্ধতম হয়েছে। তাই এই মতাবলম্বী বৈষ্ণব কবিসাধকরা কেউ প্রভু, কেউ পুত্র, কেউ সখা, আর কেউবা প্রেমিকরূপে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেছেন। শেষোক্ত কবিসাধকের সংখ্যাই বেশি।

বৃন্দাবনের ষড়গোশ্বামীর অন্যতম রূপ গোশ্বামী উজ্জ্বলনীলমণি-তে কৃষ্ণভক্তিকেই একমাত্র রসপরিনতি বলা হয়েছে। এর স্হায়ীভাব হল দুপ্রকারের-

1. বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার
2. সন্তোগ শৃঙ্গার

আবার এই দুটি প্রকারও আবার চারটি করে উপবিভাগে বিন্যস্ত।

### বিপ্রলম্ভ

1. পূর্বরাগ
2. মান (এরও দুটি ভাগ- সহেতু আর নিহেতু)
3. প্রেমবৈচিত্র
4. প্রবাস (এরও দুটি ভাগ- সুদূর আর অদূর)

### সন্তোগ

1. সংক্ষিপ্ত
2. সংকীর্ণ
3. সম্পূর্ণ
4. সমৃদ্ধিমান

বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণের লীলাবিলাস এই বিষয়পর্যায়ে বিন্যস্ত। অবশ্য, উপরোক্ত চারটি ছাড়াও বিপ্রলম্ভকে আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ভাগ করা হয়েছে নানাসময়। যেমন- অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ কিংবা, বিপ্রলম্ভা, খন্ডিতা বা, বাসরসজ্জিতা অথবা অভিসার। পুরাণ ছাড়া সাহিত্যে বা কাব্যে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির উৎস হল- সংস্কৃত পদসংকলন গ্রন্থগুলি। যথা, গাথা সপ্তশতী,..... তাছাড়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা তো এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়। বিদ্যাপতি মূলত মৈথিলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছেন। তবে অনেকে এই পদাবলিগুলির ভাষার বিশেষ মাধুর্যের জন্য একে ব্রজবুলি ভাষা বলে কল্পনা করতে চেয়েছেন। প্রাচীন এই মতটিকে পরবর্তীকালের আধুনিক সমালোচক শংকরীপ্রসাদ বসু স্বীকার করে নিয়েছেন এবং বিদ্যাপতিকে একটি সাহিত্যিক ভাষার মহান সর্জক বলে মনে করেছেন।<sup>[১]</sup> সে যাই হোক ভাষাগত এই প্রভাব যে পরবর্তীকালের কবিদেরও বিরাট প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ গোবিন্দদাস। জ্ঞানদাসের কিছু কিছু পদও এই তথাকথিত ব্রজবুলি ভাষাতেই রচিত। মধ্যযুগের বহু কবি এই ভাষাতেই পদরচনা করেছেন। এমনকি আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যখন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' লেখেন তখন তিনি লেখেন ব্রজবুলি ভাষাতেই। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস ছাড়াও যশোরাজ খান, চাঁদকাজী, রামচন্দ বসু, বলরাম দাস, নরহরি দাস, বৃন্দাবন দাস, বংশীবদন, বাসুদেব, অনন্ত দাস, লোচন দাস, শেখ কবির, সৈয়দ সুলতান, হরহরি সরকার, ফতেহ পরমানন্দ, ঘনশ্যাম দাশ, গয়াস খান, আলাওল, দীন চণ্ডীদাস, চন্দ্রশেখর, হরিদাস, শিবরাম, করম আলী, পীর মুহম্মদ, হীরামনি, ভবানন্দ প্রমুখ উল্লেখ্যযোগ্য কবি। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যিক গুণে আসামান্য। বিভিন্ন কবির লেখা কিছু পদ এখানে উল্লেখ করা হল- ১.সই কেমনে ধরিব হিয়া/আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়/ আমার আঙিনা দিয়া।/সে বধু কালিয়া না চাহে ফিরিয়া/এমতি করিল কে/আমার অন্তর যেমন করিছে/তেমনি করুক সে।/যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু/লোকে অপঘণ কয়/সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি/আর যেন কার হয়।/যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া/এমত করিল কে/আমার পরাণ যেমতি করিছে/তেমতি হউক সে।। (চণ্ডীদাস) ২.চলে নীল সাড়ি নিগারি নিগারি/পরান সহিতে মোর।/সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির/মম্মথ জুরে ভোর। (চণ্ডীদাস) ৩.এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর।/ঝম্পি ঘণ গন — জগ্তি সন্ততি/ভুবন ভরি বরি খন্টিয়া/কান্ত পাহন কাম দারুন/সঘনে খন শর হস্তিয়া।/কুলিশ শত শত পাত-মোদিত/ময়ুর নাচত মাতিয়া/মও দাদুরী ডাকে ডাহকী/ফাটি যাওত ছাতিয়া।/তিমির দিক ভরি যোর যামিনী/অখির বিজুরিক পাঁতিয়া/বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়াবি/হরি বিনে দিন রাতিয়া।। (বিদ্যাপতি)

### চেতন্যজীবনীসাহিত্য



## মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারার একবিশিষ্ট শাখা হল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কল্যাণ। মধ্যযুগে বিভিন্ন দেব-দেবীর মহিমা ও মাহাত্ম্যকীর্তন এবং পৃথিবীতে তাদের পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়ে যেসব কাব্য রচিত হয়েছে সেগুলোই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের তিনটি প্রধান ঐতিহ্যের মধ্যে মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গল ছিল অন্যতম। এই কাব্য তিনটির প্রধান চরিত্র হল যথাক্রমে মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর যারা বাংলার সকল স্থানীয় দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। এছাড়াও কিছু ছোট মঙ্গলকাব্য রয়েছে, যেমন- শিবমঙ্গল, কালিকা মঙ্গল, রায় মঙ্গল, শশী মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল ও কমলা মঙ্গল প্রভৃতি নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত প্রধান কবিরা হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বিজয় গুপ্ত, রূপরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।

## রাজসভার সাহিত্য

রাজসভার সাহিত্য হল রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত সাহিত্য। মধ্যযুগের প্রধান রাজসভার কবি ছিলেন আলাওল(১৫৯৭-১৬৭৩) এবং ভারত চন্দ্র প্রমুখ। মহাকবি আলাওল ছিলেন আরাকান রাজসভার প্রধান কবি। তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। ব্রজবুলি ও মঘী ভাষাও তার আয়ত্তে ছিল। প্রাকৃতপৈঙ্গল, যোগশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, অধ্যাত্মবিদ্যা, ইসলাম ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-ক্রিয়াপদ্ধতি, যুদ্ধবিদ্যা, নৌকা ও অশ্ব চালনা প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আলাওলের পদ্মাবতী(১৬৪৮ খৃ:) ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত মহা কাব্য। তাছাড়া :

- সতীময়না লোরচন্দ্রানী (১৬৫৯ খৃঃ)
- সপ্ত পয়কর (১৬৬৫ খৃঃ)
- সময়ফুলমলুক-বদিউজ্জামাল (১৬৬৯ খৃঃ)
- সিকান্দরনামা (১৬৭৩ খৃঃ)
- তোহফা (১৬৬৪ খৃঃ)
- রাগতালনামা

মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের প্রধান কবি ছিল ভারত চন্দ্র। তিনি তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। এই কাব্যের বিখ্যাত উক্তি হল, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"।

## শিবায়ন কাব্য

শিবায়ন কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা আখ্যানকাব্যের একটি ধারা। শিব ও দুর্গার দরিদ্র সংসার জীবন কল্পনা করে মঙ্গলকাব্যের আদলে এই কাব্যধারার উদ্ভব। শিবায়ন কাব্যে দুটি অংশ দেখা যায় – পৌরাণিক ও লৌকিক। মঙ্গলকাব্যের আদলে রচিত হলেও শিবায়ন মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এক কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই কাব্যের দুটি ধারা দেখা যায়। প্রথমটি মৃগলুরু-মূলক উপাখ্যান ও দ্বিতীয়টি শিবপুরাণ-নির্ভর শিবায়ন কাব্য। শিবায়নের প্রধান কবিরা হলেন রতিদেব, রামরাজা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র কবিচন্দ্র ও শঙ্কর কবিচন্দ্র।

## শাক্তপদাবলি

শাক্তপদাবলী হল কালী-বিষয়ক বাংলা ভক্তিগীতির একটি জনপ্রিয় ধারা। এই শ্রেণীর সঙ্গীত শাক্তপদাবলীর একটি বিশিষ্ট পর্যায়। শাক্তকবিরা প্রধানত তন্ত্রাশ্রয়ী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বলে শাক্তপদাবলীতে তন্ত্রদর্শন নানাভাবে দ্যোতিত। শাক্তপদাবলীর পদগুলিতে কালী বা শ্যামা মাতরূপে ও ভক্ত সাধক সন্তানরূপে কল্পিত। ভক্তের প্রাণের আবেগ, আকুতি, আবদার, অনুযোগ, অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার নিবেদন ছন্দোবদ্ধ হয়ে গীতধারায় প্রকাশিত হয়েছে এই পর্যায়। এই কারণে সাধনতত্ত্বের পাশাপাশি আত্মনিবেদনের ঘনিষ্ঠ আকুতি শাক্তপদাবলীর পদগুলিতে অপূর্ব কাব্যময় হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সমাজজীবন ও লৌকিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ এই পদাবলির অধ্যাত্মতত্ত্ব শেষাবধি পর্যবসিত হয়েছে এক জীবনমুখী কাব্যে।

শাক্তপদাবলী ধারাটি বিকাশলাভ করে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সময় বঙ্গদেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটকালে বৈষ্ণব ধর্মানুশীলনের পরিবর্তে শাক্তদর্শন ও শক্তিপূজা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। তার কারণ দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়ার সতীরূপের শক্তিপীঠগুলির অনেকগুলিই বঙ্গদেশে। সেই শক্তিপীঠগুলিকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে এসেছে শক্তিসাধনা। তারই ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত হয় শাক্তসাহিত্য। শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন এবং তাঁর পরেই স্থান কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের। এই দুই দিকপাল শাক্তপদকর্তা ছাড়াও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট পদকর্তা এই ধারায় সংগীতরচনা করে শাক্তসাহিত্য ও সর্বোপরি শাক্তসাধনাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য – কৃষ্ণচন্দ্র রায়,



শম্ভুচন্দ্র রায়, নরচন্দ্র রায়, হরুঠাকুর অ্যান্টনি ফিরিস্জি, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কালী মির্জা, দাশরথি রায় (দাশুরায়) প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও শাক্তপদাবলী ধারায় নিজ নিজ কৃতিত্ব স্থাপন করে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। অন্যদিকে এই শতাব্দীর জনপ্রিয় শ্যামাসঙ্গীত গায়কদের অন্যতম হলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

## নাথ সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে নাথধর্মের কাহিনি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য। প্রাচীনকালে শিব উপাসক এক সম্প্রদায় ছিল, তাদের ধর্ম ছিল নাথধর্ম। হাজার বছর আগে ভারতে এই সম্প্রদায় খ্যাতি লাভ করেছিল। তাদের গতিবিধির ব্যাপকতার জন্য সারা ভারতবর্ষে তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। নাথ অর্থ প্রভু, দীক্ষালাভের পর নামের সাথে তারা নাথ শব্দটি যোগ করত। তারা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারি ছিল। বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের সমন্বয়ে এ ধর্ম গড়ে ওঠে। এই নাথ পন্থা বৌদ্ধ মহাযান আর শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবিদ্যা ও অজ্ঞান থেকে মুক্তির জন্য এবং মহাজ্ঞান লাভ করাই নাথগণের লক্ষ্য ছিল। সাধনার মাধ্যমে দেহ পরিশুদ্ধ করে মহাজ্ঞান লাভের যোগ্য করলে তাকে পঙ্ক দেহ বলা হত। এই মতের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথ। আর শিব হল আদি নাথ। সব নাথ তার অনুসারী। দশম-একাদশ শতকে নাথধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। অই সময়ে নাথ সাহিত্য বিস্তার লাভ করে। প্রধান প্রধান নাথগন হলেন- মীননাথ, গোরখনাথ, প্রমুখ।

## বাউল সাহিত্য

বাউল মতবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত সাহিত্যই হল বাউল সাহিত্য। বাউল সাধকদের সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছেন জগন্মোহন গোসাঁই ও লালন সাঁই। লালন তার বিপুল সংখ্যক গানের মাধ্যমে বাউল মতের দর্শন এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রচার করেছিলেন। এছাড়াও বাউল কবিদের মধ্যে জালাল খাঁ, রশিদ উদ্দিন, হাছন রাজা, বাধারমণ, সিরাজ সাঁই, পাঞ্জু সাঁই, পাগলা কানাই, শীতলং সাঁই, দ্বিজদাস, হরিচরণ আচার্য, মনোমোহন দত্ত, লাল মাসুদ, সূলা গাইন, বিজয় নারায়ণ আচার্য, দীন শরৎ (শরৎচন্দ্র নাথ), রামু মালি, রামগতি শীল, মুকুন্দ দাস, আরকুন শাহ, সিতালং ফকির, সৈয়দ শাহ নূর, শাহ আব্দুল করিম, উকিল মুন্সি, চান খাঁ পাঠান, তৈয়ব আলী, মিরাজ আলী, দুলা খাঁ, আবেদ আলী, উমেদ আলী, আবদুল মজিদ তালুকদার, আবদুস সাত্তার, খেলু মিয়া, ইদ্রিস মিয়া, আলী হোসেন সরকার, চান মিয়া, জামসেদ উদ্দিন, গুল মাহমুদ, প্রভাত সূত্রধর, আবদুল হেকিম সরকার, স্বামী আমীর উদ্দিন আহমেদ, ফকির দুর্বিন শাহ, শেখ মদন, দুদ্দু সাঁই, কবি জয়দেব, কবিরাল বিজয়সরকার, ভবা পাগলা, নীলকণ্ঠ, দ্বিজ মহিন, পূর্ণদাস বাউল, খোরশেদ মিয়া, মিরাজ উদ্দিন পাঠান, আব্দুল হাকিম, মহিলা কবি আনোয়ারা বেগম ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের মাধ্যমেই বাউল মতবাদ বা বাউল সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

## বাংলা লোক সাহিত্য

বাংলাদেশের লোক সাহিত্য বাংলা সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। যদিও এর সৃষ্টি ঘটেছে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রসার ঘটেছে মৌখিকভাবে, তথাপি বাংলা সাহিত্যকে এ লোক সাহিত্য ব্যাপ্তি প্রদান করেছে, করেছে সমৃদ্ধ। পৃথক পৃথক ব্যক্তি-বিশেষের সৃষ্টি পরিণত হয়েছে জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যে যার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা চেতনার। লোক সাহিত্য মূলত মৌখিক সাহিত্য। ফলে এধরনের সাহিত্য স্মৃতিসহায়ক কৌশল, ভাষার গঠনকাঠামো এবং শৈলীর উপরও নির্ভর করে। এদেশের লোক সাহিত্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছে। এগুলো হচ্ছে মহাকাব্য, কবিতা ও নাটক, লোক গল্প, প্রবাদ বাক্য, গীতি কাব্য প্রভৃতি। লোক সাহিত্যের এই সম্পদগুলো সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে অথবা অন্য কোন উপায়ে এখনো এই অঞ্চলে টিকে রয়েছে। বহুবছর ধরে এদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। বাংলাদেশের লোক সাহিত্য এই জাতিগোষ্ঠীগুলো দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। ফলশ্রুতিতে বর্তমান বাংলাদেশের বহুমুখী বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল লোক সাহিত্যের একাংশের ব্যাখ্যায় ইতিহাসের প্রয়োজন পড়ে।

বাংলাদেশের লোক সাহিত্য লোক সাহিত্যের প্রচলিত সকল শাখায় নিজেকে বিস্তার করেছে। এগুলো হচ্ছে গল্প, ছড়া, ডাক ও খনার বচন, সংগীত, ধাঁধা, প্রবাদ বাক্য, কুসংস্কার ও মিথ। লোকগীতি বাংলা লোক সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের সংগীত মূলত কাব্যধর্মী। এদেশীয় সংগীতে বাদ্যযন্ত্রের চেয়ে মৌখিক সুরের দক্ষতার উপর অধিক নির্ভরশীলতা লক্ষ করা যায়। লোকগীতিকে আমরা সাতটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি। এগুলো হচ্ছেঃ প্রেম, ধর্মীয় বিষয়, দর্শন ও ভক্তি, কর্ম ও পরিশ্রম, পেশা ও জীবিকা, ব্যঙ্গ ও কৌতুক এবং এসবের মিশ্রণ। অন্যদিকে এদেশীয় লোকসাহিত্যে আমরা গানের বিভিন্ন শাখা দেখতে পাই। এগুলো হচ্ছেঃ বাউল গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, কবিগান, জারিগান, সারিগান, ঘাটু গান, যাত্রা গান, ঝুমুর গান, জাগের গান প্রভৃতি।

বাংলা লোক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হল:

- মৈমনসিংহ গীতিকা (মৈমনসিংহ অঞ্চলের প্রচলিত পালাগানগুলোকে একত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা বলা হয়। এই গানগুলো প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। তবে ১৯২৩-৩২ সালে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই গানগুলো সম্পাদনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশ করেন। বর্তমান নেত্রকোনা জেলার আইথর নামক স্থানের আধিবাসী চন্দ্রকুমার দে এসব গাঁথা সংগ্রহ করছিলেন।)
- পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের প্রচলিত লোকসাহিত্যকে একত্রে পূর্ববঙ্গ গীতিকা বলা হয়। প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসা পালাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৯২৬ সালে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্যে পালাগুলো সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। পরে ১৯৭১-১৯৭৫ সালে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ও সাত খণ্ডে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশ করেন।)
- ঠাকুরমার ঝুলি
- ঠাকুরদাদার ঝুলি

## বাংলা গদ্যের উন্মেষপর্ব

চিঠিপত্র লেখা এবং দলিল-দস্তাবেজ লেখার প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের সূত্রপাত। দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সংস্কৃত ও পার্সি - এই দুই ভাষার প্রভাবে পরিকীর্ণ। আদি সাহিত্যিক গদ্যে কথ্যভাষার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ-এর রচনা রীতি বাংলা গদ্যের অন্যতম আদি নিদর্শন। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ গ্রন্থ থেকে নিম্নরূপ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। লক্ষ্যণীয় এই অংশে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার কথ্য ভাষা প্রতিফলিতঃ-

"ফাদিয়া দেশে এক সিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল। লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল, এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতামাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাতে পৌছিল। তাহার এক বইন আছিল ; তাহার পশ্বে লাগাল পাইল ; ভাইয়ে বইনের চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল, "তুমি কী আমারে চিন?" "না, ঠাকুর" বইনে কহিল। সে কহিল, "আমি তোমার ভাই।" ভাইয়ের নাম শুনিয়া উনি বড় প্রীত হইল। ভাইয়ে ঘরের খবর লইল, জিজ্ঞাস করিল, "আমারদিগের পিতামাতা কেমন আছেন?" বইনে কহিল, "কুশল।" দুইজনে কথাবার্তা কহিল।"

প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত আলালের ঘরে দুলাল বাঙালী ভাষায় রচিত আদি গদ্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এটি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থের ভাষা 'আলাল ভাষা' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে কথ্যরূপী গদ্য একটি পৃথক লেখ্য রূপে উন্নীত হয়।

"রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড়ো ঢিলে দেন-হচ্ছে হব-খাচ্ছি খাব-বলিয়া অনেক বেলায় স্নান- আহার করেন- তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন- কেহ বা তাস পেটেন-কেহ বা মাছ ধরেন- কেহ বা তবলায় চাট্টদেন-কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন- কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভালো বুঝেন- কেহ বা বেড়াতে যান- কেহ বা বহি পড়েন। কিন্তু পড়াশুনা অথবা সং কথায় আলোচনা অতি অল্প হইয়া থাকে। হয়তো মিথ্যা গালগল্প কিংবা দলাদলির ঘোঁট, কি শব্দ তিনটা কাঁঠাল খাইয়াছে এই প্রকার কথাতেই কাল ক্ষেপণ হয়। বালীর বেণীবাবুর অন্য প্রকার বিবেচনা ছিল। এদেশের লোকদিগের সংস্কার এই যে স্কুলে পড়া শেষ হইলে লেখাপড়া শেষ হইল। কিন্তু এ বড়ো ভ্রম, আজন্ম মরণ পর্যন্ত সাধনা করিলেও বিদ্যার কূল পাওয়া যায় না, বিদ্যা চর্চা যত হয় ততই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে। বেণীবাবু এ বিষয় ভালো বুঝিতেন এবং তদনুসারে চলিতেন। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহকর্ম সকল দেখিয়া পুস্তক লইয়া বিদ্যানুশীলন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে চোদ্দ বৎসরের একটি বালক-গলায় মাদুলি-কানে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া টিপ করিয়া একটি গড় করিল। বেণীবাবু এক মনে পুস্তক দেখিতেছিলেন বালকের জুতার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'এসো বাবা মতিলাল এসো- বাটির সব ভালো তো ?' মতিলাল বসিয়া সকল কুশল সমাচার বলিল। বেণীবাবু কহিলেন- অদ্য রাতে এখানে থাকো কল্য প্রাতে তোমাকে কলিকাতায় লইয়া স্কুলে ভর্তি করিয়া দিব। ক্ষণেক কাল পরে মতিলাল জলযোগ করিয়া দেখিল অনেক বেলা আছে। চঞ্চল স্বভাব- এক স্থানে কিছু কাল বসিতে দারুণ ক্লেশ বোধ হয়- এজন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া বাটির চতুর্দিকে দাঁড়ুড়ে বেড়াইতে লাগিল- কখন টেবুলের টেঁকিতে পা দিতেছে- কখন বা ছাতের উপর গিয়া দুপদুপ করিতেছে-কখন বা পথিকদিগকে ইট-পাটকেল মারিয়া পিটান দিতেছে ; এইরূপে দুপ-দাপ করিয়া বালী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল-কাহারো বাগানে ফুল ছেঁড়ে-কাহারো গাছের ফল পাড়ে-কাহারো মটকার উপর উঠিয়া লাফায়- কাহারো জলের কলসি ভাঙিয়া দেয়।"

বাংলা গদ্য শুরুতে ছিল সংস্কৃতি গদ্যের চালে রচিত যার প্রমাণ বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ। প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরোয়া'র আলোচনা থেকে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির সুস্পষ্ট পরিচয়ে মেলে। তিনি লিখেছেন :

‘শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঘরোয়া’ পড়লুম। চমৎকার বই। ঘরোয়া মানে ঠাকুর পরিবারের ঘরের কথা। . . . অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং স্বগুণে স্বনামধন্য, সুতরাং তাঁর কোনও পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি চিত্রবিদ্যায় একজন আর্টিস্ট বলে দেশে বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু এ পুস্তকে তিনি নিজের কৃতিত্ব বিষয়ে কোনও কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি ঠাকুর পরিবারের ঘরোয়া কথা বলেছেন। পূর্বে বলেছি এ-পুস্তক ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস নয়, তাই বলে উপন্যাসও নয়।’

এ গদ্যকাঠমোর চারিত্র্য ঋজু এবং প্রাজ্ঞ। অনেকটাই মুখের ভাষার কাছাকাছি যদিও তাতে প্রকাশক্ষমতা হ্রাস পায় নি।

## রবীন্দ্রসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ই মে, ১৮৬১ - ৭ই আগস্ট, ১৯৪১) (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ - ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতশ্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মূলত এক কবি। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি কাব্যরচনা শুরু করেন। তাঁর প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫২। তবে বাঙালি সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রধানত সংগীতশ্রষ্টা হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুই হাজার গান লিখেছিলেন। কবিতা ও গান ছাড়াও তিনি ১৩টি উপন্যাস, ৯৫টি ছোটগল্প, ৩৬টি প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থ এবং ৩৮টি নাটক রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা রবীন্দ্র রচনাবলী নামে ৩২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর সামগ্রিক চিঠিপত্র উনিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত নৃত্যশৈলী "রবীন্দ্রনৃত্য" নামে পরিচিত।

## কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) অনুসারী কবি। তাঁর কবিকাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় কাব্য তিনটিতে বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পর্বের সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান ও কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু ছিল মানব হৃদয়ের বিষমতা, আনন্দ, মর্ত্যপীতি ও মানবপ্রেম। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত মানসী এবং তার পর প্রকাশিত সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০) ও ক্ষণিকা (১৯০০) কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোম্যান্টিক ভাবনা। ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই চিন্তা ধরা পড়েছে নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটলে বলাকা (১৯১৬) কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিবর্তে আবার মর্ত্যজীবন সম্পর্কে আগ্রহ ফুটে ওঠে। পলাতকা (১৯১৮) কাব্যে গল্প-কবিতার আকারে তিনি নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। পূর্ববী (১৯২৫) ও মহায়া (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আবার প্রেমকে উপজীব্য করেন। [১২৪] এরপর পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬) ও শ্যামলী (১৯৩৬) নামে চারটি গদ্যকাব্য প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ দশকে কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। [১২৪] এই সময়কার রোগশয্যা (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১) ও শেষ লেখা (১৯৪১, মরণোত্তর প্রকাশিত) কাব্যে মৃত্যু ও মর্ত্যপীতিকে একটি নতুন আঙ্গিকে পরিস্ফুট করেছিলেন তিনি। শেষ কবিতা "তোমার সৃষ্টির পথ" মৃত্যুর আট দিন আগে মৌখিকভাবে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলি, উপনিষদ, কবীরের দোঁহাবলি, লালনের বাউল গান ও রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে প্রাচীন সাহিত্যের দূরত্বের পরিবর্তে তিনি এক সহজ ও সরস কাব্যরচনার আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। আবার ১৯৩০-এর দশকে কিছু পরীক্ষামূলক লেখালেখির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাস্তবতাবোধের প্রাথমিক আবির্ভাব প্রসঙ্গে নিজ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছিলেন কবি। বহির্বিষয়ে তাঁর সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থটি হল গীতাঞ্জলি। এ বইটির জন্যই তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। নোবেল ফাউন্ডেশন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটিকে বর্ণনা করেছিল একটি "গভীরভাবে সংবেদনশীল, উজ্জ্বল ও সুন্দর কাব্যগ্রন্থ" রূপে।

## ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। মূলত হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, সবুজ পত্র প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির চাহিদা মেটাতে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলি রচনা করেছিলেন। এই গল্পগুলির উচ্চ সাহিত্যমূল্য-সম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের "সাধনা" পর্বটি (১৮৯১-৯৫) ছিল সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল পর্যায়। তাঁর গল্পগুচ্ছ গল্পসংকলনের প্রথম তিন খণ্ডের চুরাশিটি গল্পের অর্ধেকই রচিত হয় এই সময়কালের মধ্যে। গল্পগুচ্ছ সংকলনের অন্য গল্পগুলির অনেকগুলিই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রজীবনের সবুজ পত্র পর্বে (১৯১৪-১৭; প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নামানুসারে) তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল "কঙ্কাল", "নিশীথে", "মণিহার", "ক্ষুধিত পাষণ্ড", "স্ত্রীর পত্র", "নষ্টনীড়", "কাবুলিওয়ালা", "হেমন্তী", "দেনাপাওনা", "মুসলমানীর গল্প" ইত্যাদি। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ লিপিকা, সে ও তিনসঙ্গী গল্পগ্রন্থে নতুন আঙ্গিকে গল্পরচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি বা আধুনিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতেন। কখনও তিনি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণকেই গল্পে বেশি প্রাধান্য দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটগল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্র, নাটক ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। তাঁর গল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রায়ণ হল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তিন কন্যা ("মনিহারা", "পোস্টমাস্টার" ও "সমাপ্তি" অবলম্বনে)[১৩৬] ও চারুলতা ("নষ্টনীড়" অবলম্বনে), তপন সিংহ পরিচালিত অতিথি, কাবুলিওয়ালা ও ক্ষুধিত পাষণ, পূর্ণেন্দু পত্নী পরিচালিত স্ত্রীর পত্র ইত্যাদি।

## উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট তেরোটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এগুলি হল: বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুর্ঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) ও চার অধ্যায় (১৯৩৪)। [১৩৩] বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এদুটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা। [১৩৩] এরপর থেকে ছোটগল্পের মতো তাঁর উপন্যাসগুলিও মাসিকপত্রের চাহিদা অনুযায়ী নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজ পত্র, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

চোখের বালি উপন্যাসে দেখানো হয়েছে সমসাময়িককালে বিধবাদের জীবনের নানা সমস্যা। নৌকাডুবি উপন্যাসটি আবার লেখা হয়েছে জটিল পারিবারিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে। গোরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সংঘাত ও ভারতের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি। ঘরে বাইরে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা আরও সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে তাঁর পরবর্তী যোগাযোগ উপন্যাসেও। চতুর্ঙ্গ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের “ছোটগল্পধর্মী উপন্যাস”। স্ত্রীর অসুস্থতার সুযোগে স্বামীর অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি – এই বিষয়টিকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ দুই বোন ও মালঞ্চ উপন্যাসদুটি লেখেন। এর মধ্যে প্রথম উপন্যাসটি মিলনাত্মক ও দ্বিতীয়টি বিয়োগাত্মক। রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস চার অধ্যায় সমসাময়িক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি বিয়োগাত্মক প্রেমের উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায়ের ঘরে বাইরে ও ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি।

## প্রবন্ধ ও পত্রসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এইসব প্রবন্ধে তিনি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধগুলি সমাজ (১৯০৮) সংকলনে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে লেখা রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে কালান্তর (১৯৩৭) সংকলনে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও আধ্যাত্মিক অভিভাষণগুলি সংকলিত হয়েছে ধর্ম (১৯০৯) ও শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬) অভিভাষণমালায়। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে ভারতবর্ষ (১৯০৬), ইতিহাস (১৯৫৫) ইত্যাদি গ্রন্থে। সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬) ও সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদি ভারতীয় সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন যথাক্রমে প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭) ও আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭) গ্রন্থদুটিতে। লোকসাহিত্য (১৯০৭) প্রবন্ধমালায় তিনি আলোচনা করেছেন বাংলা লোকসাহিত্যের প্রকৃতি। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ রয়েছে শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮) ইত্যাদি গ্রন্থে। ছন্দ ও সংগীত নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন যথাক্রমে ছন্দ (১৯৩৬) ও সংগীতচিন্তা (১৯৬৬) গ্রন্থে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন শিক্ষা (১৯০৮) প্রবন্ধমালায়। ন্যাশনালিজম (ইংরেজি: Nationalism, ১৯১৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণ করে তার বিরোধিতা করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন বিষয়ে যে বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি রিলিজিয়ন অফ ম্যান (ইংরেজি: Religion of Man, ১৯৩০; বাংলা অনুবাদ মানুষের ধর্ম, ১৯৩৩) নামে সংকলিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা জন্মদিনের অভিভাষণ সভ্যতার সংকট (১৯৪১) তাঁর সর্বশেষ প্রবন্ধগ্রন্থ। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭) নামে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০) ও আত্মপরিচয় (১৯৪৩) তাঁর আত্মকথামূলক গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পত্রসাহিত্য আজ পর্যন্ত উনিশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী (ভ্রাতৃপুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা), ভানুসিংহের পত্রাবলী (রানু অধিকারীকে (মুখোপাধ্যায়) লেখা) ও পথে ও পথের প্রান্তে (নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা) বই তিনটি রবীন্দ্রনাথের তিনটি উল্লেখযোগ্য পত্রসংকলন।

## নাট্যসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে ছিলেন নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক নাট্যমঞ্চে মাত্র ষোলো বছর বয়সে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত হঠাৎ নবাব নাটকে (মলিয়ার লা বুর্জোয়া জাঁতিরোম অবলম্বনে রচিত) ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই অলীকবাবু নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮১ সালে তাঁর প্রথম গীতিনাট্য বাঙ্গালী-প্রতিভা মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে তিনি ঋষি বাঙ্গালীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে কালমৃগয়া নামে আরও একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। এই নাটক মঞ্চায়নের সময় তিনি অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

গীতিনাট্য রচনার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কাব্যনাট্য রচনা করেন। শেকসপিয়রীয় পঞ্চাঙ্ক রীতিতে রচিত তাঁর রাজা ও রাণী (১৮৮৯) ও বিসর্জন (১৮৯০) বহুবাহু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং তিনি নিজে এই নাটকগুলিতে অভিনয়ও করেন। ১৮৮৯ সালে রাজা ও রাণী নাটকে বিক্রমদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। বিসর্জন নাটকটি দুটি ভিন্ন সময়ে মঞ্চায়িত করেছিলেন তিনি। ১৮৯০ সালের মঞ্চায়নের সময় যুবক রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ রঘুপতির ভূমিকায় এবং ১৯২৩ সালের মঞ্চায়নের সময় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কাব্যনাট্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ও মালিনী (১৮৯৬)।

কাব্যনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ প্রহসন রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই পর্বে প্রকাশিত হয় গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭) ও ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭)। বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসটিকেও চিরকুমার সভা নামে একটি প্রহসনমূলক নাটকের রূপ দেন।

১৯০৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ রূপক-সাংকেতিক তত্ত্বধর্মী নাট্যরচনা শুরু করেন। ইতিপূর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪) নাটকে তিনি কিছুটা রূপক-সাংকেতিক আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর থেকে একের পর এক নাটক তিনি এই আঙ্গিকে লিখতে শুরু করেন। এই নাটকগুলি হল: শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), তাসের দেশ (১৯৩৩), কালের যাত্রা (১৯৩২) ইত্যাদি। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শান্তিনিকেতনে মঞ্চ তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অভিনয়ের দল গড়ে মঞ্চস্থ করতেন। কখনও কখনও কলকাতায় গিয়েও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতেন তিনি। এই সব নাটকেও একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১৯১১ সালে শারদোৎসব নাটকে সন্ন্যাসী এবং রাজা নাটকে রাজা ও ঠাকুরদাদার যুগ্ম ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৪ সালে অচলায়তন নাটকে অদীনপুণ্যের ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৫ সালে ফাল্গুনী নাটকে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৭ সালে ডাকঘর নাটকে ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউলের ভূমিকায় অভিনয়। নাট্যরচনার পাশাপাশি এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ পুরোনো নাটকগুলি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে নতুন নামে প্রকাশ করেন। শারদোৎসব নাটকটি হয় ঋণশোধ (১৯২১), রাজা হয় অরুণপরতন (১৯২০), অচলায়তন হয় গুরু (১৯১৮), গোড়ায় গলদ হয় শেষরক্ষা (১৯২৮), রাজা ও রাণী হয় তপতী (১৯২৯) এবং প্রায়শ্চিত্ত হয় পরিত্রাণ (১৯২৯)।

১৯২৬ সালে নটীর পূজা নাটকে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গানের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ধারাটিই তাঁর জীবনের শেষ পর্বে “নৃত্যনাট্য” নামে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। নটীর পূজা নৃত্যনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ একে একে রচনা করেন শাপমোচন (১৯৩১), তাসের দেশ (১৯৩৩), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮) ও শ্যামা (১৯৩৯)। এগুলিও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরাই প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন।

## আধুনিক বাংলা কবিতা

১৮০০- বর্তমান, চলমান। মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে যিনি সেতুবন্ধন তৈরি করেন তিনি হলেন যুগ সন্ধি স্রবণের কবি: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) মধ্যযুগীয় পয়ারমাত্রার ভেঙে কবি প্রবেশ করেন মুক্ত ছন্দে রচনা করেন সনেট। লাভ করেন, আধুনিক কবিতার জনকের খ্যাতি। ভোরের পাখি : ইউরোপীয় ভাবধারার বোমান্টিক ও গীতি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)। মহির্মহ বৃক্ষের ন্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। মহাকাব্য ব্যতীত সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তিনি খ্যাতির স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেননি। রবীন্দ্রানুসারী ভাবধারার অন্যান্য কবিরা হলো: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী বিশ শতকের শুরুতে কবিতায় পঞ্চপুরুষ রবীন্দ্রবিরোধিতার করেন, তারা হলো : মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আধুনিক কবিতার স্বর্ণযুগ: রবীন্দ্র ভাব ধারার বাইরে এসে দশক প্রথার চলু করেন তিরিশের পঞ্চপাণ্ডব কবি: অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭), জীবননন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০)।

## বাংলা নাটক

## বাংলা কথাসাহিত্য

বাংলা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের নতুনতম অঙ্গ। এর সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। প্যারিচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরে দুলাল* প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এর আখ্যানভাগে এবং রচনশৈলীতে উপন্যাসের মেজাজ পরিলক্ষিত হয়। বাঙলা উপন্যাসের একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে দীর্ঘ কাল বাংলা উপন্যাসে ইউরোপীয় উপন্যাসের ধাঁচ ছায়া ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাকে ঋদ্ধ করেছেন তাঁর হাতেও উপন্যাস নতুন মাত্রা লাভ করেছে যদিও সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ মনে করেন না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আরেকজন প্রভাবশালী ঔপন্যাসিক। তবে এরা সবাই মানুষের ওপর তলের ওপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

বিংশ শতকের প্রথমভাগে বুদ্ধদেব বসু, অচ্যুতকুমার সেন প্রমুখের হাতে বাংলা কথাসাহিত্য একটি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। তবে বাংলা উপন্যাস নতুন মাত্রা লাভ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও কমলকুমার মজুমদারের হাতে। এদের হাতে উপন্যাস বড় মাপের পরিবর্তে মানবিক অস্তিত্বের নানা দিকের ওপর আলোকপাত করে বিকশিত হয়। বস্তুত: রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত সবচেয়ে কুশলী উপন্যাস শিল্পী। তারই পদরেখায় আমরা দেখতে পাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কে। এরা উপন্যাসকে মানবিক অস্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক জটিলতার ওপর নিবিড় আলোকপাত করেছেন, লেখনীশৈলীর জোরে উপন্যাসকে সাধারণ পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন এবং একই সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পশৈলীতে এনছেন দৃঢ় গদ্যের সক্ষমতা।

সুমথনাথ ঘোষ ও গজেন্দ্রকুমার মিত্রের বাংলা কথাসাহিত্য নতুন মাত্রা লাভ করে। সুমথনাথ ঘোষ শুধু সাহিত্যশ্রষ্টাই ছিলেন না, প্রকাশক হিসাবেও ছিলেন স্বনামধন্য। একশোরও বেশি বই লিখেছেন সুমথনাথ। প্রথম উপন্যাস, ‘বাঁকা স্রোত’। তিনিই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও সুসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সঙ্গে যৌথভাবে শুরু করলেন ‘মিত্র ও ঘোষ’ প্রকাশনা। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন ‘মোহন সিং -এর বাঁশি’, ‘ছোটদের বিশ্বসাহিত্য’র মতো বই। অনুবাদ করেছেন আলেকসান্দার দুমার ‘থ্রি মাস্কেটিয়ার্স’, ওয়াল্টার স্কটের ‘আইভ্যান হো’ বা চার্লস ডিকেন্সের ‘ডেভিড কপারফিল্ড’। [১২]

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণ নতুন করণকৌশল নিয়ে আবির্ভূত হলেন বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ। তিনি বাঙলা উপন্যাসকে নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন। বাংলা উপন্যাস দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিকদের হাতে পরিপুষ্ট হয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদ একাই শত বর্ষের খামতি পূরণ করে দিলেন। তাঁর উপন্যাসের অবয়ব হলো সবজাতা লেখকের বর্ণনার পরিবর্তে পাত্র-পাত্রীদের মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ সংলাপকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি ছোট এবং স্বল্প পরিসরে অনেক কথা বলার পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন তিনি। হুমায়ূন আহমেদ দেখালেন যে ইয়ারোপীয় আদলের বাইরেও সফল, রসময় এবং শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস লেখা সম্ভব।

১৯৮০’র দশকে হুমায়ূন আহমেদের সবল উপস্থিতি অনুভব করার আগে বাংলা উপন্যাস মূলত পশ্চিমবঙ্গের ঔপন্যাসিকদের হাতে গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের অবদান ছিল তুলনামূলক ভাবে কম, গুণগত মানও প্রস্ফুট ছিল না। এ সময়কার কয়েকজন প্রধান লেখক হলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, হর্ষ দত্ত প্রমুখ।

একবিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের উত্তরাধিকার বহন করে। এ সময় কিছু কিছু নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাসের স্বাক্ষর রেখেছেন কতিপয় লেখক। উত্তরআধুনিক ধ্যানধারণা অবলম্বন করেও লিখেছেন কেউ কেউ। তবে নতুন কোন ধারা প্রবল বেগে ধাবিত করার মতো নতুন কারো আবির্ভাব এখনো হয় নি। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নাসরিন জাহান, হুমায়ূন আজাদ, আবুল বাশার, শহিদুল জহির, আব্দুলি বরাদী প্রমুখ শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের সবল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে। পশ্চিমবঙ্গেও অনেক নতুন নতুন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে যদিও প্রচলিত রীতির বাইরে যাওয়ার শক্তিশালী হাতের দেখা পাওয়া যায়নি। এই একই সময়ে কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা ১৪টি উপন্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি ১৯৩০-১৯৫০ কালপরিসরে লিখিত। জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সম্পূর্ণ নতুর ধাঁচের, চিন্তা-মননে এবং শৈলীতে।

## বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

সাহিত্যে বর্ণনামূলক গদ্যকে প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা। এর সমার্থক শব্দগুলো হল - সংগ্রহ, রচনা, সন্দর্ভ। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু শৈল্পিক, কাল্পনিক, জীবনমুখী, ঐতিহাসিক কিম্বা আত্মজীবনীমূলক হয়ে থাকে। যিনি প্রবন্ধ রচনা করেন তাকে প্রবন্ধকার বলা হয়। প্রবন্ধে মূলত কোনো বিষয়কে তুলে ধরে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য খুব সমৃদ্ধ। যুগে যুগে অনেক প্রাবন্ধিক তাদের প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচিত্র প্রবন্ধ এবং প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ। তাছাড়া আরও অনেক প্রাবন্ধিক আছেন, যেমন- কাজী আবদুল ওদুদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল হক প্রমুখ।

## সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র

## কবি ও সাহিত্যিক

মধ্যযুগ (১৩৫০-১৮০০খ্রিস্টাব্দ)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের (১২০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) শুরুতে (১২০০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ) সময়কে কোন কোন গবেষক **বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ** বলে অভিহিত করে থাকেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। কেউ কেউ মনে করেন এই রাজনৈতিক পরিবর্তন বাংলার শিক্ষা সমাজ এবং সাহিত্যকে ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত করে, যে কারণে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয় নি। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার আগ পর্যন্ত এ সময়টাই অন্ধকার যুগ। তবে এটি একটি বিতর্কিত অভিধা।

## প্রাক-আধুনিক যুগ (১৮০০খ্রিস্টাব্দ-১৯০০খ্রিস্টাব্দ)

- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## আধুনিক যুগ (১৯০০খ্রিস্টাব্দ-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

- কাজী নজরুল ইসলাম
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়
- বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
- শিবরাম চট্টোপাধ্যায়
- জীবনানন্দ দাশ
- সুকুমার রায়
- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- অক্ষয়কুমার দত্ত
- অদ্বৈত মল্লবর্মণ
- সৈয়দ মুজতবা আলী
- সুকান্ত ভট্টাচার্য

## বর্তমান

- |                         |                      |                           |                  |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| ■ শঙ্খ ঘোষ              | ■ নলিনী দাস          | ■ শক্তি চট্টোপাধ্যায়     | ■ সত্যজিত্ রায়  |
| ■ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়   | ■ বাণী বসু           | ■ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী  | ■ হুমায়ুন আজাদ  |
| ■ মানিক বন্দোপাধ্যায়   | ■ বিমল কর            | ■ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ    | ■ আহমদ শরীফ      |
| ■ তারশংকর বন্দোপাধ্যায় | ■ সমরেশ বসু          | ■ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় | ■ হুমায়ুন আহমেদ |
| ■ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | ■ সুভাষ মুখোপাধ্যায় | ■ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়    | ■ সুবিমল বসাক    |
| ■ আশাপূর্ণা দেবী        | ■ শামসুর রাহমান      | ■ বুদ্ধদেব গুহ            | ■ বেগম রোকেয়া   |
| ■ মহাশ্বেতা দেবী        | ■ আজিজুর রহমান আজিজ  | ■ ফালগুনী রায়            | ■ তসলিমা নাসরিন  |
| ■ লীলা মজুমদার          | ■ সমীর রায়চৌধুরী    | ■ জয় গোস্বামী            | ■ দেবী রায়      |
|                         |                      | ■ সমরেশ মজুমদার           | ■ শওকত ওসমান     |



- |                        |                            |                      |                   |
|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| ■ আলাউদ্দিন আল<br>আজাদ | ■ আখতারুজ্জামান<br>ইলিয়াস | ■ আবুল মনসুর আহমেদ   | ■ দাউদ হায়দার    |
| ■ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর   | ■ মলয় রায়চৌধুরী          | ■ রফিক আজাদ          | ■ সুবোধ সরকার     |
| ■ আল মাহমুদ            | ■ আবু ইসহাক                | ■ বাসুদেব দাশগুপ্ত   | ■ নির্মলেন্দু গুণ |
|                        | ■ আবুল বাশার               | ■ মুহম্মদ জাফর ইকবাল | ■ আসাদ চৌধুরী     |
|                        |                            | ■ হেলাল হাফিজ        |                   |

## সাহিত্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

আরও তথ্যের জন্য দেখুন: সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

- ১৯১৩: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## সাহিত্য পুরস্কার

আরও দেখুন: বাংলা সাহিত্য পুরস্কার

- বাংলা একাডেমী পুরস্কার
- একুশে পদক
- সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার
- আনন্দ পুরস্কার
- জ্ঞানপীঠ পুরস্কার
- রবীন্দ্র পুরস্কার

## আরও দেখুন

## তথ্যসূত্র

১. *বাংলা সাহিত্য পরিচয়*, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. xxiii
২. *লাল নীল দীপাবলী বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী*, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৯
৩. *বাংলা সাহিত্য পরিচয়*, পৃ. ৮
৪. "বিদ্যায় সাহিত্যে শিল্পে", *বঙ্গভূমিকা*, সুকুমার সেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৪৫-৯৬
৫. *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৭-৪৩
৬. *লাল নীল দীপাবলী*- ড. হুমায়ুন আজাদ; বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত- ওয়াকিল আহমদ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- মাহবুবুল আলম
৭. *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৪
৮. *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়চণ্ডীদাস বিরচিত*, ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা, শিলালিপি, কলকাতা, ২০০৫ (২য় প্রকাশ), প্রবেশক পৃষ্ঠা ৪
৯. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২২৮-২৯
১০. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতীয় সাধনার ঐক্য
১১. শংকরীপ্রসাদ বসু, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস
১২. <http://www.epaper.eisamay.com/Details.aspx?id=7387&boxid=3653203>

## বহিঃসংযোগ

- লাইব্রেরি অব কংগ্রেস - বাংলা বিভাগ

- এ পৃষ্ঠায় শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ১৫:৪৫টার সময়, ৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
- লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।  
উইকিপিডিয়া®, অলাভজনক সংস্থা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।